ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

ইউনিট ১২

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। যার প্রমাণ পলাশীর যুদ্ধের পর পর একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ। পরাধীনতার একশ বছর পরেও স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ দেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজারা। পরবর্তী সময়ে স্বাধীকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধীকার স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই ইউনিটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলন সমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরবের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা আছে ইংরেজ শাসকরা ভারত ছাড়তে বাধ্য জেনে, কীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে, দ্বিখন্ডিত করে বাংলাকে- বাঙালি জনগোষ্ঠিকে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ ঃ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম
পাঠ-১২.২ ঃ ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন
পাঠ-১২.৩ ঃ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন
পাঠ-১২.৪ ঃ খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন
পাঠ-১২.৫ ঃ লাহোর প্রস্তাব
পাঠ-১২.৬ ঃ ব্রিটিশ শাসন অবসান

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১২.১ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মহাবিদ্রোহ, স্বত্ববিলোপনীতি, সাম্রাজ্যবাদী, লাখেরাজ সম্পত্তি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ধর্মীয় স্বাধীনতা।

ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ– এসবই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্র এবং পেশওয়া দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। ব্রিটিশের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাননি। অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তাছাড়া ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লি সম্রাট পদ বিলুপ্ত করায় সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ও ক্ষুব্ধ হন।

অর্থনৈতিক কারণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সামাজিকভাবে হেয় হন। তাছাড়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর এ অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ অর্থ, সোনা রূপাসহ মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করে তাতে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি, সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকুরি আইনের ফলে বহুলোক বেকার কর্মহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হতে থাকে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার জনকল্যাণমূলক হলেও রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান এসব মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন; সবই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ

সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে পদবি, বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তবে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে হিন্দু সিপাহিদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে দুই ধর্মের সৈন্যরা ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপান্ডে নামে এক সিপাহী। দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মিরাট, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহী জনতার এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করে। এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িতদের বেশির ভাগ হয় যুদ্ধে শহিদ হন অথবা তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে শহীদ হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান হন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের উপর নেমে আসে চরম অমানবিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ–

১. সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একক নেতৃত্বের অভাব।
২. সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের অভাব।
৩. শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি, অধিকাংশ দেশীয় রাজা, জমিদার, সৈন্যদের একটি অংশের অসহযোগিতা।
৪. অপর দিকে ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল, উন্নতমানের অস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের জয়ী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব

১. এর ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।
২. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণা পত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারি গুরুত্ব হচ্ছে, বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে থাকেনি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসৃত নীতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আর ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তারই বহি:প্রকাশ এই সংগ্রাম। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৭ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯৪৭

২। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে মিশ্রিত ছিল– (অনুধাবন)

i) গরুর চর্বি ii) মহিষের চর্বি iii) শুকরের চর্বি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল–

i) নেতৃত্বের অভাব ii) বিচ্ছিন্ন আন্দোলন iii) উন্নত সমরাস্ত্র ও সুসজ্জিত বাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা কলিঙ্গ যুদ্ধ, সম্রাট অশোকের চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার তথা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিহার করেন।

৪। উদ্দীপকে সম্রাট অশোকের রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহারের সাথে ভারত ব্রিটিশ শাসনামলে কার ঘোষণার মিল দেখা যায়?

(ক) রাজা পঞ্চম জর্জ (খ) রানী ভিক্টোরিয়া (গ) রানী মেরী (ঘ) রাজা ২য় চার্লস

৫। উক্ত ঘোষণার পর ভারতে

i) ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয় ii) স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয় iii) ভারতীয়, ব্রিটিশ সমঅধিকার নিশ্চিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নীনা ও মীরা বড় চাচার সাথে বাহাদুর শাহ পার্কে বেড়াতে আসে। চাচা জানান যে এ পার্কটি এদেশের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষী, চাচার বক্তব্য শুনে নীনা এ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরদিকে মীরা মনে করে ঐ সংগ্রাম দানা বেধেঁছিল দেশের শিল্প কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

ক. মঙ্গল পান্ডে কে ছিলেন?

খ. এনফিল্ড রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগ্রামটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. মীরার মত ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অর্থনৈতিক কারণই মূলত দায়ী– আপনি কী একমত? ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ-১২.২ ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- উপমহাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নতুন যুগ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, জাতীয়তাবাদী চিন্তা, রাজনৈতিক সংগঠন, সিভিল সার্ভিস সর্বহারা বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা, ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন,

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল; স্বদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একদল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন বাংলার রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরাই। তাঁদের জাতীয় ঐক্যবোধ দেশপ্রেম বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। রাজনীতি সচেতন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধকারী সংগঠন গুলোর জন্মও হয়েছিল বাংলায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক দাবিগুলো মূলত ছিল 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের' দাবি সমূহের মার্জিত রূপ। নেহরু বাঙালির এই ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনী ভারত সন্ধানে লিখেছেন 'বাংলাদেশের নেতারা সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের নেতা রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।'

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ একটা রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব বোধ করছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহুত জাতীয় সম্মেলনে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোলকাতায় একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে যখন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের শেষ ধাপে উপস্থিত। তখনই সরকারি উদ্যোগে কংগ্রেস গঠনের আয়োজন শুরু হয়। বড় লাট ডাফরিনের ইচ্ছায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর প্রাপ্ত এ্যালন অক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা করেন। ভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় হিউম কংগ্রেস গঠনে সফল হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন কোলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্রোপাধ্যায়।

মুসলিম লীগ

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও বেশিরভাগ মুসলিম নেতা এতে অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার ফলে অবহেলিত পশ্চাদপদ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের চরম বিরোধিতা শুরু করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারা কংগ্রেস থেকে আরো দূরে সরে যায়। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের জন্য একটি সংগঠন জরুরি ছিল।

নবাব সলিমুল্লাহ

অপরদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে শাসন সংস্কার চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় আনে। এসব কারণে, নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখা দেয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায়, বড় লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে বড় লাটের কাছে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা সংক্রান্ত একটি দাবি নামা পেশ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'। সম্মেলন শেষে নওয়াব ভিখারুল মুলক্-এর সভাপতিত্বে মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নবাব সলিমুল্লাহ 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান, জাফর আলী খান, মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল।

এভাবে মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

এক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা। সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

দুই. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা। মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

তিন. এসব উদ্দেশ্য ব্যহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নবাব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, জাফর আলী খান, হাকিম আজমল খান ও মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন আগা খান।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ অক্টোবর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেক প্রজাতন্ত্রের তাসখন্দ শহরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যখন রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। একই বছর নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে দুনিয়া কাঁপানো সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়। ফলে পৃথিবীতে প্রথম সর্বহারা মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার এই সর্বহারা বিপ্লবের খবর যাতে ভারতে আসতে না পারে তার জন্য নানা ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে সময় ভারত জুড়েও চলছিল বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, উত্তাল গণআন্দোলন। এই অবস্থার পটভূমিতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় দলটির জন্ম দেশের বাইরে।

লেনিন

মোট ৭ জন সদস্য নিয়ে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুহম্মদ শফিক এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিশেষ করে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ঠেকাতে পারেনি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম থেকে মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বে এবং আব্দুল হালিম, আবদুর রাজ্জাক খাঁ ও শামসুল হুদা প্রমুখের প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতাকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূত্রপাত ঘটে। কমরেড মুজাফফর আহমদ শুধু বাংলা নয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

যখন বাংলার রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি একটি রাজনৈতিক দল গঠনে প্রস্তুত; তখনই লর্ড ডাফ্‌রিনের ইচ্ছায় হিউম জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহযোগিতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক মুসলিম নেতা এতে যোগদান করেনি। তাছাড়া ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ছিল। এ অবস্থায় তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি সংগঠন প্রয়োজন ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ তাদের সেই প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ গঠনের একযুগেরও বেশি সময় পার হয়েছে যখন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশের মাটিতে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত পার্টির প্রভাবে বাংলায়, কোলকাতাকে ঘিরে কমরেড মুজাফফর আহ্‌মদের উদ্যোগে যাত্রা শুরু হয় বাংলা তথা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা তিনটি রাজনৈতিক দলের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯০৬
(গ) ১৯০৯ (ঘ) ১৯১৬

২। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?

(ক) মুজাফফর আহ্‌মেদ (খ) আব্দুল হালিম
(গ) আবদুর রাজ্জাক (ঘ) মনি সিং

৩। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়–

i) লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায়
ii) এলান অক্টোভিয়ান হিউমের ঐক্যান্তিকতায়
iii) কতিপয় শিক্ষিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

কোলকাতার নির্মল সেন এক পর্যায়ে বুঝতে পারলেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে দেশ শাসনে তথা দাবী আদায়ের কাজে লাগাতে হলে একটি সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। তখন একাজে কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তিবর্গও এগিয়ে এসেছিলেন।

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির মত উনবিংশ শতকে ভারতে গড়ে ওঠা সংগঠনটি কী নামে পরিচিত?

(ক) জাতীয় যুক্তফ্রন্ট (খ) মুসলিম লীগ অব ভারত
(গ) ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (ঘ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

৫। উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় উপমহাদেশে গঠিত হয়েছিল–

i) জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা লাঘবে
ii) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য
iii) ভারতীয়দের অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৩ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বাংলা ভাগ, 'বিভেদ ও শাসননীতি', বাংলা প্রেসিডেন্সি, বঙ্গভঙ্গ রহিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম।

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এর বাস্তবায়ন হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী করা হয় কোলকাতাকে।

মানচিত্র ১ : বাংলাদেশ ১৯০৫-১৯১১

বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. উপমহাদেশের একতৃতীয়াংশ লোকের বসবাস বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

২. রাজধানী হওয়ার কারণে আর্থ-সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। পশ্চাদপদ মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলার উন্নতি অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে বাংলা ভাগ প্রয়োজন ছিল।

৩. সর্বোপরি কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। মূলত কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো অপর দিকে পূর্ব বাংলার উন্নতির নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবে লর্ড কার্জনে 'বিভেদ ও শাসন নীতি' প্রয়োগ করে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে দিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। অপর দিকে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়, অপর দিকে মুসলমান সম্প্রদায় প্রচণ্ড মর্মাহত এবং হতাশ হয়। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। পরে বিলেতি শিক্ষা বর্জনও এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

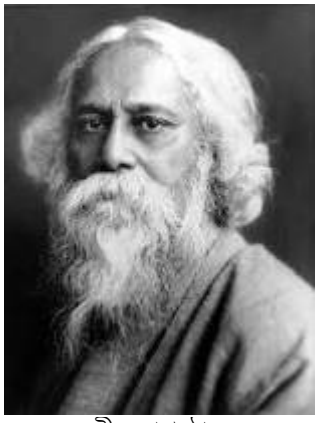
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলে। একই সঙ্গে দেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠে বাংলার নিজস্ব তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা। অপর দিকে বিলেতি শিক্ষা বর্জন এবং আন্দোলনের সাথে যুক্তদের বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ফলে প্রয়োজনে গড়ে উঠে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানগুলো রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রজণীকান্ত সেন প্রমুখ। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন।

আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

মুসলমান সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কারণে আন্দোলন জাতীয় রূপলাভে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষ, এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজন, দারিদ্র সমাজ এই আন্দোলনের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে আন্দোলন সার্বজনীন একটি শক্তিশালী ভিত্ গড়তে সক্ষম হয়নি।

এ আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি দ্রব্য বর্জন সফল হয়নি। কারণ কোলকাতার অবাঙালি মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী এবং বাংলার গ্রাম গঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সর্বোপরি এই আন্দোলন গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে জনগণ আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। ফলে গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সফলতার দ্বারে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের হতাশার দিক হচ্ছে- এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। যার পরিণতি হচ্ছে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায় ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর পরিণতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। বঙ্গবঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতিতে চির ধরে; স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতার পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গভঙ্গ কত সালে রদ করা হয়?
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯০৬ (গ) ১৯০৯ (ঘ) ১৯১১

২। বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশদের কোন উদ্দেশ্য কাজ করেছিল?
(ক) মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি (খ) হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার নীতি
(গ) 'বিভেদ ও শাসন নীতি' (ঘ) রাজ্য সম্প্রসারণ করার নীতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের নাগরিক সুযোগ সুবিধায় শৃঙ্খলা তথা সুশাসন কায়েম করতে শহরটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং দুই অংশের জন্য দুইজন মেয়র নির্বাচতি হয়েছেন।

৩। উদ্দীপকের এই বিভক্তি ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার সাথে মিল লক্ষ করা যায়?
(ক) ভারত বিভাগ (খ) বঙ্গভঙ্গ (গ) পাকিস্তান সৃষ্টি (ঘ) বঙ্গভঙ্গ রদ

৪। উক্ত ঐতিহাসিক বিভক্তির মূল কারণ হলো–
i) প্রশাসনিক ii) অর্থনৈতিক iii) রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন
i) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ii) দিজেন্দ্রলাল রায় iii) রজণীকান্ত সেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?
(ক) বিদেশী পণ্য গ্রহণ (খ) বিদেশি পণ্য বর্জন (গ) কোরিয় পণ্য গ্রহণ (ঘ) বিলেতি পণ্য বর্জন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রোহন ও রাফসান নতুন বছরের জন্য কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। রোহন তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি বেল্ট জুতা ইত্যাদি রাখলেও রাফসান বিদেশি পণ্য পরিত্যাগ করে দেশীয় পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয়। অবশেষে রাফসান ভাই রোহনকে দেশীয় পণ্য কেনার জন্য রাজী করাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশী পণ্য কিনে বাসায় আসে।

ক. মুসলিম লীগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
খ. সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় কেন?
গ. পাঠ্য পুস্তকের কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাফসান দেশীয় পণ্য ক্রয় করে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. তুমি কী মনে কর রোহনের মানসিকতা নিজ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ? যুক্তি দিন।

পাঠ-১২.৪ খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, খলিফা, রাওলাট আইন, সশস্ত্র বিপ্লব, গেরিলা পদ্ধতি, চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী, স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার।

ভূমিকা

হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই ঐক্য স্বল্পকালের হলেও সারা ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ

ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তাঁরা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। কিন্তু এই যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে জার্মানির পক্ষে যোগদানের কারণে শাস্তি স্বরূপ তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও দুই ভাই মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার আইনের নৈরাশ্যজনক ধারাগুলো ভারতীয়দের মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করে। ঠিক এ সময় একদল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের চেষ্টা করে। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক রাওলাট আইন পাস করে। কংগ্রেস এই আইনের তীব্র নিন্দাও প্রতিবাদ করে। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে হরতাল পালিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিন পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ফলে প্রায় ৪০০ সাধারণ মানুষ নিহত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।

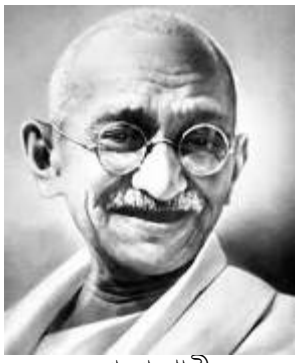
মহাত্মা গান্ধী

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নিলে হঠাৎ করে এই আন্দোলন বন্ধের ডাক দেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যায়। অপর দিকে তুরস্কের

জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক বিদেশী বাহিনীকে দেশ থেকে বিতারিত করেন। তুরস্কে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে খিলাফত আন্দোলনও থেমে যায়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য

এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশস্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিতে বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়ে ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এই আন্দোলন কোলকাতা কেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। এই সময় বিপ্লবীরা ইংরেজ কর্মকর্তা, ইংরেজদের হত্যা, বোমা হামলার মধ্য দিয়ে ইংরেজ সরকারের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কোলকাতায় গোপনে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র আনার পরিকল্পনাও করা হয়।

মাস্টারদা সূর্যসেন

ক্ষুদিরাম

প্রীতিলতা

বিপ্লবীদের কোনো কোনো পরিকল্পনা সফল হয়, কোনোটি ব্যর্থ হয়। ইংরেজ প্রশাসনের চরম নির্যাতন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড কোনো কিছুই বিপ্লবীদের তাদের দুঃসাহসী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের বেঙ্গলঅর্ডিনেন্স জারির কারণে বহু বিপ্লবী কারারুদ্ধ হয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হলেও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। বাঙালি তরুণরা মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, সাঁর আসল নাম সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। তিনি চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করে, সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে 'স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার' গঠনের ঘোষণা দেয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। ফলে গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সূর্যসেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংক্ষিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং তাঁর লাশ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও

ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা। প্রীতিলতা তার যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। সফল আক্রমণের পরে সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে ধরা পড়ার আগেই বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন। এই সশস্ত্র আন্দোলন চলে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ গণবিচ্ছিন্নতা। শুধু কিছু সংখ্যক দুঃসাহসী শিক্ষিত দেশপ্রেমিক তরুণ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বিপ্লবীদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে সাধরণ মানুষ আতঙ্কিত ছিল। বিষয়টি গোপনে পরিচালিত হতো বলে এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

তাছাড়া বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠি এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সনাতন ধর্মীয় কিছু আচার আনুষ্ঠানিকতা মেনে শপথ নিতে হতো বলে মুসলমানদের পক্ষে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি চরম দমননীতির কারণে গণবিচ্ছিন্ন বিপ্লবীরা অসীম সাহস দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন। সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহূতি, দেশপ্রেম ও সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে ছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ পরবর্তী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দুটি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও যৌথ নেতৃত্বের কারণে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দেশব্যাপী গণসচেতনতা জাগরণ সৃষ্টিতে সফল হয়। অপর দিকে দুঃসাহসী তরুণদের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের দেশপ্রেম আত্মাহূতি কিংবদন্তীর মতো মানুষে মুখে মুখে ফিরতে থাকে। সুতরাং এই সব আন্দোলন গণমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

খিলাফত

১। কে তুরস্ককে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন?

(ক) রেজা শাহ (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) আবুল কালাম আজাদ (ঘ) মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

২। খিলাফত আন্দোলন বলতে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

(ক) ১৯১৯ সালের মুসলিম জাহানের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন
(খ) ১৯২০ সালে তুরস্কে ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন
(গ) তুরস্কের অখণ্ডতা ও মুসলিম জাহানের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন
(ঘ) বাংলার মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার যে আন্দোলন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (অভিন্ন তথ্য ভিত্তিক)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। সে সময় থেকেই খলিফা পদটি মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদ হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে।

৩। উদ্দীপকের ন্যায় মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদের সম্মান রাখতে বৃটিশ ভারতে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে?

(ক) অসহযোগ (খ) খিলাফত
(গ) স্বদেশী (ঘ) ভারতছাড়

৪। ভারতে উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা–
(ক) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী
(খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী
(গ) জওহরলাল নেহরু ও মতিলাল নেহরু
(ঘ) আবুল কালাম আজাদ ও আবুল হাশিম

অসহযোগ

১। মহাত্মা গান্ধী কখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন?
(ক) ১৯০৯ সালে (খ) ১৯১৪ সালে
(গ) ১৯১৮ সালে (ঘ) ১৯১৯ সালে

২। কোন আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম সবাই সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল?
(ক) খিলাফত ও অসহযোগ (খ) অসহযোগ
(গ) ফরায়েজি (ঘ) ওয়াহাবী

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
এই অল্প কিছুদিন আগে বিভিন্ন চা বাগানে নিম্ন মজুরীর প্রতিবাদে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তা অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকলে চা শ্রমিক নেতা নিতাই তাদের সহিংস আচরণ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবান জানান।

৩। উদ্দীপকের শ্রমিক নেতা নিতাই, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন স্বনামধন্য নেতার গৃহীত নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন–
(ক) মাস্টারদা সূর্যসেন (খ) স্যার সৈয়দ আহ্মেদ
(গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) আবুর কালাম আজাদ

৪। উক্ত নেতার কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল–
i) হিন্দু মুসলিম ঐক্য দৃঢ়করন
ii) নির্যাতন মূলক আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
iii) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সশস্ত্র

১। মাস্টারদার প্রকৃত নামের ক্ষেত্রে কোনটি সমর্থনযোগ্য–
(ক) মাস্টার মশাই (খ) সূর্যসেন
(গ) আরজ আলী (ঘ) অজয় সেন

২। প্রীতিলতা কোন স্থান আক্রমনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
(ক) পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব (খ) পাহাড়তলী সানশাইন ক্লাব
(গ) পাহাড়তলী খ্রিস্টার ক্লাব (ঘ) পাহাড়তলী ইউরেশিয়ান ক্লাব

৩। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন কোনটি?
(ক) নেতৃত্বের অভাব (খ) গণবিচ্ছিন্নতা
(গ) ধর্মীয় বিরোধ (ঘ) একতার অভাব

পাঠ-১২.৫ লাহোর প্রস্তাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি বলতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এর পরিণতি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বরাজদল, বেঙ্গল প্যাক্ট, নেহরু রিপোর্ট, চৌদ্দ দফা, সাইমন কমিশন রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক, দ্বি-জাতিতত্ত্ব, দিল্লি প্রস্তাব-১৯৪৬।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর সমর্থকদের নিয়ে 'স্বরাজদল' গঠন করেন। তিনি মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা ও সমতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামের এই চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা এবং দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণে। পরবর্তী কালে 'নেহরু রিপোর্ট', জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, ব্রিটিশ সরকারের সাইমন কমিশন রিপোর্ট, লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠক; কোনটিই সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এই পটভূমিতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ

জওহরলাল নেহরু

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

এই আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া নির্বাচনের পরে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। মুসলমানদের মধ্যে এর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। জিন্নাহ নেহরুর বক্তব্যের প্রতিবাদে তার 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ঘোষণা দেন। তার দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয়য়ের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু ও মুসলমানের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

অবশ্য মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী। দুটি প্রস্তাবের একটিতেও বাংলার মুসলিম প্রধান অঞ্চলের

কথা বলা হয়নি। চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

লাহোর প্রস্তাব : প্রধান ধারাসমূহ

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ. কে ফজলুল হক ২৩ মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তাই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ–

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।
খ. পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।
গ. সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাবটি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি অসম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জিন্নাহ বেআইনীভাবে 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী নয়, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য এই যে- এটি গ্রহণ বর্জন এবং বাতিল কোনোটাই করা হয়নি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	লাহোর প্রস্তাব কী পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল? এই প্রস্তাবের ধারাসমূহ অনুযায়ী কী পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যার মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। ভারতের এক জটিল রাজনৈতিক সংকটের সময় এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের আইন সভার সদস্যদের সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়- যার নাম পাকিস্তান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব জয়ের কৃতিত্ব ছিল কার?
(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) চিত্তরঞ্জন দাস
(গ) মতিলাল নেহেরু (ঘ) শরৎ বসু

২। বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় কখন?
(ক) ১৯২০ সালে (খ) ১৯২১ সালে
(গ) ১৯২২ সালে (ঘ) ১৯২৩ সালে

৩। লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? (জ্ঞানমূলক)
(ক) মাওলানা ভাসানী (খ) আল্লামা ইকবাল
(গ) এ কে ফজলুল হক (ঘ) চৌধুরী রহমতুল্লাহ

৪। লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অঞ্চলসমূহ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ii) পূর্বাঞ্চালে iii) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উনিশ শতকে চল্লিশের দশকে ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। মনে করা হয়ে থাকে এ প্রস্তাবের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। এটি বৃটিশ ভারতের তৎকালিন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ক. কোন আইনের বলে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়?
খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে আপনার পঠিত কোন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে? তার মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ – আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-১২.৬ ব্রিটিশ শাসন অবসান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি বিষয়ে (১৯৩৭-৪৭) মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- অখন্ড বাংলার উদ্যোগ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ক্রিপস মিশন প্রস্তাব; আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকার, মিত্রবাহিনী, বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, নৌবিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, ভারত স্বাধীন আইন-১৯৪৭।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারত ব্যাপী তীব্র গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। উপমহাদেশের বাইরে এ সময় পৃথিবী ব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে তিনি তাঁর দৃঢ় ঘোষণায় উল্লেখ করেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধনিতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, ঊষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন 'আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করবো। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই।'

কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। সরকার এই আন্দোলন দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ঐ দিনই মধ্য রাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাগারে বন্দি হন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের কারণে অহিংস আন্দোলন ভয়াবহ সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে সারা ভারত নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়, মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধ পুলিশের গুলি সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রেখে শহীদ হন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

এই আন্দোলনের পরপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সব মিলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ

যখন দেশের অভ্যন্তরে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বা Indian National Army (INA)। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সবার অলক্ষ্যে দেশত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি ইংরেজদের শত্রু ভূমি জার্মানিতে যান এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠনে জার্মান সরকারের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সরকারে সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিল ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। এই দুঃসাহসী বাঙালি নেতার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পন করে। কোহিমা ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগ, মিত্রবাহিনীর বিজয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান রাজনীতিবিদদের উত্থান ঘটে। পরপর যে চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সবগুলোই গঠন করেন মুসলিম নেতারা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি নতুন পার্টি জনসমর্থন লাভ করে। এর সভাপতি ছিলেন এ কে ফজলুল হক। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা থেকে দু'দলই ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে এই মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। ফলে কৃষক প্রজা পার্টিও দুর্বল হয়ে পড়ে। জিন্নাহের সাথে মতবিরোধের কারণে ফজলুল হক ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ বছর ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বহুদলের সমাবেশে গঠিত এই মন্ত্রিসভা বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করে। ফজলুল হক চেয়ে ছিলেন এই নতুন ধারার মাধ্যমে বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত্যু বরণ করে। এই বছর ১৩ এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে।

পরের বছর প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। যা প্রকারন্তরে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে

এ নির্বাচন ও নির্বাচনের ফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃত পক্ষে সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভার সময়কাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কলকাতার দাঙ্গা, স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক চরম পর্যায়ে চলে গেলে তা এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এ রকম এক জটিল ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব নামে খ্যাত।

মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তিকালে শরৎচন্দ্র বসু এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর বাংলাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম দিকে কংগ্রেস মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও জিন্নাহ, গান্ধীর প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। মুসলিম লীগের গোঁড়াপন্থীরাও সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব সব দলের সমর্থন হারায়।

একই সঙ্গে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী-এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যুক্তবাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ফলে উক্ত আইন অনুসারে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামের এক কৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। আর ১৫ আগস্ট জন্ম হয় আরেক রাষ্ট্র ভারতের, যার সঙ্গে যুক্ত হয় পশ্চিম বাংলা। এ ভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ হলেও তাঁর অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের আনুগত্যে যেমন ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমন তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এ কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপর দিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দিই বাংলার মুসিলম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরুণ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হয় এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী এক মাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান পাকিস্তান অংশে এই

নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং তাঁর অনুসারী ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ এ্যাটলি সরকার বুঝতে পারেন যে সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয়, ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশন মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রিমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এতে পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ তারা মনে করে যে, পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে অখণ্ড ভারত গঠন দাবির প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড় লাট ওয়েভেল এই অবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি নেহরুর মুসলিম লীগ স্বার্থ বিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড় লাটের আহ্বানে নেহরু সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগেই ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড ওয়েভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটনকে ভারতের বড় লাট হিসেবে পাঠানো হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশ-বিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের ৩ তারিখে মাউন্টব্যাটন সুস্পষ্টভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে তা ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন। যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়। যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করেন? সতীর্থদের সঙ্গে এর পিছনের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্ব মুহূর্তে শুধু বাংলা না সারা ভারত জুড়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। ভারতবাসী স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংল্যান্ডের নব নির্বাচিত লেবার পার্টি সরকার বুঝতে পারে এই অবস্থায় বেশি দিন ভারত শাসন করা যাবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বড় লাট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করেন এবং ঐ বছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গান্ধীজি কত সালে "ভারতছাড়" আন্দোলন প্রচার করেন?

(ক) ১৯৪২ (খ) ১৯৪৩

(গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৪৫

২। ১৯৪৩ খ্রিঃ সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ–

i) মানুষকে দিশেহারা করে তোলে

ii) অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে

iii) ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। INA নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)

(ক) Indian National Army (খ) Indian National Assembly

(গ) Indian aceademy for national Army (ঘ) International New Army

৪। বৃহত্তর যুক্ত বাংলার প্রস্তাবকে বলা হয়–

(ক) বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব (খ) হাশিম-বসু প্রস্তাব

(গ) হাশিম-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব (ঘ) হক-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ	১. খ	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক		
	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫ ঃ	১. খ	২. ক	৩. খ			
	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৬ ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. ক		